সপ্তম পরিচ্ছেদ

লোক শিল্প

ভূমিকা ঃ

শুধু উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারই নয়, যে কোন দেশের বিশেষ করে কৃষি নির্ভর জনবলে সমৃদ্ধ ও স্বল্প আয় বিশিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প তথা লোক শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও বেকার সমস্যার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এরূপ ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও প্রাধান্য স্বনির্ভর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। আদিম যুগে বিশেষ করে যখন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয় নি তখন থেকেই মানুষ শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করেছে। কোচবিহারের লোকায়ত ক্ষুদ্র শিল্প বেশ প্রাচীন, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। ইংরেজ আমলে বাংলার প্রাচীন তাঁত শিল্প যেমন সারা ভারতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের তাঁত শিল্প ও আজ সেই ঐতিহ্য মেনে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের একাধিপত্য ছিল নবদ্বীপ, নদীয়া ও বিষ্ণুপুরের অধীন। আজ এই শিল্পের বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঘটেছে। কোচবিহার জেলা সদরের পুন্ডীবাড়ী ও তুফানগঞ্জ মহকুমার কামাতফুলবাড়ি গ্রামের হস্ত চালিত তাঁত শিল্প আজ বাংলার প্রাচীন কুটীর শিল্পের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সেনই প্রথম গভীর অনুরাগের সঙ্গে বাংলার এই ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ লোকশিল্পের পরিচয় শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন।"[১] জেলার লোকশিল্পীদের প্রত্যেকেরই শিল্প কর্মগুলি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত এবং পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুগামী এখানে লোকশিল্পের সঙ্গে সমাজ, সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা মিলেমিশে একাকার। প্রসঙ্গত বলা যায় লোকশিল্পীর চেয়েও শিল্পবস্তুটি মুখ্য। জেলার পাঁচটি মহকুমার (জেলা সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও হলদিবাড়ী ব্লক) নিবিড় ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই বাঁশ, কাঠ, বেত, শোলা মাটি, পাটি পাট ও তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করে অসংখ্য লোকশিল্পী লোকচক্ষুর আড়ালে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে বংশপরম্পরায় নিজেদের পূর্বপুরুষ প্রদত্ত শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে বাংলা তথা ভারতের সুনাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন। কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কিছু লোকশিল্পের কথাই আলোচিত হয়েছে আমাদের এই লোকশিল্প পরিচ্ছেদে।

পাটি শিল্প ঃ

বাংলার লোকশিল্প তথা কুটীর শিল্পের অন্যতম এই পাটিশিল্প। এই শিল্পের ব্যবহারিক প্রাধান্য ছিল একদিন মূলত বাংলাতেই। কিন্তু আজ পাটিশিল্পীদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও নৈপুণ্য পাটির গুণগতমান ও অভিনব সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পাটিশিল্প আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলার পাটিশিল্পীগণ শুধুমাত্র তাদের জীবন - জীবিকার জন্যই নয়, লোকশিল্পের এই আঙ্গিকটির বিকাশ ঘটাতেও বিভিন্ন ভাবে যুক্ত। অন্যান্য ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের সঙ্গে পাটি শিল্প আজ অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। কোচবিহারের এই শিল্পের সমৃদ্ধি ও প্রসার ঘটাতে পাটি শিল্পী সম্প্রদায়ের যে সকল শিল্পী তাদের শৈল্পিক নৈপুণ্যতায়, কারুকার্য গঠনে, দক্ষতায়, সৌন্দর্যবোধ প্রয়োগ করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ হল কোচবিহার জেলা সদরের ঘুঘুমারী নিবাসী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে ও ধলুয়াবাড়ী নিবাসী শ্রীমতী টগর রাণী দে। উভয়েই আজ নিজস্ব শিল্প কর্মের উৎকর্ষ বিচারে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত।

কোচবিহার জেলায় অন্যান্য কুটির শিল্পের পাশাপাশি এই পাটি শিল্প আজ শিল্পকর্ম ও বিপণনের ক্ষেত্রে সবার উপরে। এই জেলায় প্রায় তিন হাজার পরিবার ও পনের হাজার মানুষ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বাঁশ, শোলা, পাট ইত্যাদি কারুশিল্পের মত এখানেও ছোট বড়, নারীপুরুষ সকলেই এই কাজে সিদ্ধ হস্ত। কোচবিহার জেলার বিশেষ করে ঘুঘুমারী, ধলুয়াবাড়ী ও তুফানগঞ্জ মহকুমার ধনমতিয়া গ্রামের মেয়েরা এই শিল্পকে তাদের জীবিকার একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কোচবিহারের পাটিশিল্প মূলত মাইগ্রেটেড লোকশিল্প। "অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইল, ময়মন সিংহ, নেত্রকোনা অঞ্চলের বেতিয়ার সম্প্রদায়ের পাটিশিল্প মূলত মাইগ্রেটেড লোকশিল্প। "অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইল, ময়মন সিংহ, নেত্রকোনা অঞ্চলের বেতিয়ার সম্প্রদায়ের পূর্ববঙ্গীয়গণই বংশানুক্রমিকভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।"[২] সেই সুবাদে বলা যায় দেশভাগ হবার পর থেকে এই শিল্প এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। কোচবিহারের গ্রামীণ অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এই পাটিশিল্প। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার এই সম্প্রদায়ের মানুষ বেশীরভাগ এসে হাজির হন ঘুঘুমারী,

হরিণচড়া, তুফানগঞ্জ মহকুমার ধনমতিয়া গ্রামে। নিবিড় ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে এবং কোচবিহার জেলার গ্রামভিত্তিক বেতকর, পাটিকর, পাইটাল ও পাটি শিল্পীদের উপর ১৫/১০/৯৫ ইং থেকে ১/১১/৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে এক পারিবারিক সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই "জেলার উক্ত সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষগণ ঘুঘুমারী, ঘেঘীর ঘাট, পুষুনার ডাঙ্গা, গাঙালের কুঠী, হাওয়ার গাড়ী, বাইশগুড়ি, বালাসী, দেওচড়াই, ঘোগারকুঠী, ধনমতিয়া, তুফানগঞ্জ, পানি গ্রাম, বারকোদালী প্রভৃতি গ্রামে এই শিল্পের অবস্থান।"[৩]

পাটি তৈরীর মূল উপকরণই হল পাটিগাছ। এক অর্থে এটি কৃষিভিত্তিক লোকশিল্প। গাছ থেকেই এই গাছের জন্ম। গোড়া তুলে এই গাছ লাগানো হয়। মূল চারাগাছ পাওয়া যায় ধলুয়াবাড়ী, প্রেমেরডাঙা, আমবাড়ী ও দেওচড়াই গ্রামে। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারাগাছ লাগানো হয়। দোঁয়াশ বা এঁটেল মাটি এই চারাগাছের উপযুক্ত জমি। গাছ সাধারণত দশ- বার ফুট লম্বা হয়। অনেক ক্ষেত্রে চার - পাঁচ ইঞ্চি মোটা (পরিধি) হয়। গাছের রঙ সবুজ, ফুলের রঙ সাদা। ঘুঘুমারী গ্রাম নিবাসী প্রবীণ পাটিশিল্পী নারায়ণ চন্দ্র দে পাটি গাছ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ছড়ায় বলেন "কৃষ্ণ বরণ গাছ তার রাধিকা বরণ ফুল, মধ্যের শাঁস ফেলে দিয়ে বাকল তার মূল।"

সাধারণত পাটিবেত থেকেই শীতলপাটি তৈরী হয়। পাটি যত নরম হবে পাটির গুণগত মানও তত বৃদ্ধি পাবে। জমি থেকে ব্যবহারযোগ্য পাটিগাছ গুলি প্রথমে কেটে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এর পর আঁশগুলো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফালি করা হয়। একটি গাছে তিনটি ফালি বের করা হয়। প্রথমের ফালিটি দিয়ে তৈরী হয় শীতলপাটি। এই বেতের ফালি গুলিকে এক দিনের মধ্যে শুকিয়ে ভাতের ফেনের মধ্যে ৪০-৫০ মিনিট ফুটিয়ে জলে ধুয়ে আবার শুকিয়ে নিলে একেবারে সাদা রূপ নেয়। এর পর এই পাটিগাছের ছালটি শীতল পাটি তৈরীর উপযোগী হয়ে ওঠে। নীচের অংশ দিয়ে কম দামের পাটি তৈরী হয়।

উন্নত কারিগরি পদ্ধতিতে পাটি শিল্পে নানারূপ চিত্র, লতা - পাতা, ফুল ও বিচিত্র কারুকার্য সৃষ্টি হচ্ছে। কোচবিহারের ঘুঘুমারী গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র দে আবিষ্কার করেন এরূপ এক রঙিন কারুকার্যমন্ডিত পাটি যার নাম 'কমল কোষ পাটি'। এ পাটির বৈশিষ্ট্য হল রঙিন কাপড়, বেড কভার ও গরোদের কাপড়ের মত যে কোন লতাপাতা ফুল, পশুপাখীর ছবি বুননের, মাধ্যমে তৈরী করা। তাঁরই সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অধ্যবসায়, দক্ষতা এবং সৌন্দর্যবোধকে প্রয়োগ করে কারিগরি কালাকৌশলকে আরও আশ্চর্যমন্ডিত করে তুলেছেন তাঁর আবিষ্কৃত 'কমলকোষ' পাটিতে। জেলার ঘুঘুমারী, ধলুয়াবাড়ী অঞ্চলের অনেক দক্ষ পাটি শিল্পী এই কমলকোষ পাটিতে মানচিত্র, বাড়ীঘর, মন্দির, মসজিদ, গীর্জার প্রতিচ্ছবি অনায়াসে নিখুঁত বুননের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া অপর শিল্পী ধলুয়াবাড়ী নিবাসী শ্রীমতী টগর রাণী দে পাটি শিল্পের নূতন শিল্পকর্মে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে পার্স, ভ্যানিটি ব্যাগ, ঝুড়ি, স্কুলব্যাগ, পাখা, ক্যালেন্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের অভিনব শিল্প সামগ্রী তৈরী করেন।

পাটিবেত বা পাটি শিল্পের উপকরণ মূলত কৃষিজ, প্রাকৃতিক কাঁচামাল। "জেলায় স্থান বিশেষে একে মোতরা, মুক্তা পাটি, দই পাটি, তারা, চাচরা, শীতলি এবং কালোমাণিক বলা হয়।"[৪] এটি পাটগাছের মতই লম্বা, সবুজ রঙের এক ধরনের উদ্ভিদ। আসামের গোয়ালপাড়া, ডিব্রুগড়, কামরূপ, অরুণাচল, মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পাটি গাছ জন্মালেও দক্ষ শিল্পীর অভাবে এই শিল্পের প্রসার ঘটেনি। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই তিন মাস পাটিবেত চাষের উপযুক্ত সময়। সাধারণ পাটি চিওর শুকনো চিড়াইবেত যেমন চিওর ও ফালি বেত এবং কাঁচা বেতের মলই ভেজানোর সুবিধার্থে একটি চৌবাচ্চার মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হয়। আবার শীতল ও কমলকোষ পাটির সূতি বেত প্রস্তুত করতে কাজের জল রাখার জন্য একটি মাটি'র চারিতে বা সূতিবেত সিদ্ধ করার জন্য একটি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িও ব্যবহার করা হয়। চিড়াই বেত সাধারণত পাঁচ প্রকার - ফালিবেত, সলই, সূতিবেত, সূতি বুকা ও আতি। এই সূতি বেত গুলো শীতল পাটির চেক, কমলকোষ পাটির নক্সা, এবং অন্যান্য শিল্প সামগ্রী প্রস্তুতে শিল্পীর অনুভূতি ও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী যে কোন রঙে রঙিন করে নেওয়া যেতে পারে। পাতালী সূতি ক্রমিক নং অনুযায়ী বুননের সূত্র বা ফরমূলাকে বলা হয় পালোই। এই পালোই এর মাধ্যমে ফিছ ভাঙার সূত্র আছে যার মাধ্যমে পাটির বুনোট তৈরী হয়। যে সকল সূত্রের মাধ্যমে নক্সাযুক্ত পাটির বুনোট তৈরী হয় সেগুলি হল — ভরণের সূত্র, কাণি ভাঙাসূত্র, ফিছ ভাঙা সূত্র, হালা তোলা সূত্র ও মুড়িভাঙা সূত্র।

জেলার বাইশটি গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা উপাচারগত ও গুণগত মানানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যে পাটিগুলি দেখতে পাই সেগুলি মূলত চার রকম। যথা ১) কমলকোষ পাটি ২) শীতল পাটি ৩) বেতের পাটি এবং ৪) বুকার পাটি। এই শীতল পাটি আবার দুই রকমের। যেমন — রাশি শীতল পাটি এবং ভুসনাই শীতলপাটি। বর্তমানে কোচবিহার জেলার প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে তিন হাজার পরিবারে পনের হাজার মানুষ এই শিল্পকর্মে যুক্ত।

প্রাথমিক পর্যায়ে শীতল পাটি ও সাধারণ পাটি বুননের মাধ্যমে রঙিন চেক, ডোরা, বাইলাম, বাটা ও জামদানী ইত্যাদি নানা প্রকার ডিজাইন অঙ্কন করা হয়। এরূপ নকসা যুক্ত পাটি সাধারণত ২/২ সূত্রেই বুনোট করা হয়। আর কমলকোষ পাটির ক্ষেত্রে রঙিন সূতি বেতের সাহায্যে ৪/১, ১/৪ স্টার, মোট্রা ও চতুষ্কোণী ফরমূলায় তৈরী হয়।

একটি সাতফুট বাই পাঁচফুট মাপে শীতল পাটি তৈরী করতে একজন শ্রমিকের দুই দিন সময় লাগে। বর্তমানে কোচবিহারের পাটির বাজার ও চাহিদা বাংলার বাইরে বিহার, দিল্লী, লক্ষ্মৌ, সিকিম, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি জায়গায় বেশী। জেলার লোকউৎসব ও মেলা গুলি এই পাটি বিপণনের ও প্রদর্শনের একমাত্র স্থান। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে এই লোকশিল্পটি কোচবিহারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে চলেছে। বাংলার কৃষি ভিত্তিক শিল্পগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের নিদর্শন হিসেবে কোচবিহারের লোকশিল্প আজ অনেক সমৃদ্ধ। জেলা ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তর তাদের প্রতিযোগিতামূলক বাৎসরিক প্রদর্শনীর মাধ্যমেও এই শিল্প ও শিল্পীদের উৎসাহিত করে চলেছেন।

হোগ্‌লা ঃ

কোচবিহারের স্বল্প প্রচলিত অথচ জনপ্রিয় লোকশিল্প হল এই হোগ্‌লা শিল্প। এতদঞ্চলে এটি পাটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হোগ্‌লা নামক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ এই হোগ্‌লা শিল্পের প্রধান উপকরণ। বিছানার চাদর, সতরঞ্চি বিকল্প হিসেবে হোগলাপাটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ঘরের ছাদের ছাউনি, বেড়া প্রভৃতি কাজেও জেলার অনেক গ্রামেই হোগ্‌লার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। এর বুনোট পাটির মত নক্‌সা বা Motive নয়। সরাসরি বাঁশের চাটাইয়ের মত এর বুনোট। তুফানগঞ্জ মহকুমার ধনমতিয়া গ্রাম, ঘুঘুমারী ও শুকারুর কুঠী (জেলাসদর) ও বলরামপুরে এই লোকশিল্প, লোকশিল্পী ও হোগলা নামক জলজ উদ্ভিদ দেখা যায়। পাটির বিভিন্ন নক্‌সা সমন্বিত উচ্চমান ও উচ্চদামের নিরিখে হোগ্‌লা শিল্প শহরাঞ্চলে তেমন ভাবে জনপ্রিয় হতে পারেনি। লোকশিল্পের এই আঙ্গিকটির সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের যোগসূত্রই বেশি।

মৃৎশিল্প ঃ

লোকশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন হল মৃৎশিল্প। কোচবিহার জেলায় এই শিল্পের সঙ্গে জীবন জীবিকার স্বার্থে জড়িত বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পী পূর্ববঙ্গীয় ময়মনসিংহ ও পাবনা অঞ্চলের পাল পদবীধারী মানুষগণ। দৈনন্দিন ব্যবহার্য মাটির হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, সরা, পিঠে তৈরীর সাঁজ তৈরীতে অভ্যস্ত হলেও কোচবিহার সদর, দিনহাটা মহকুমার অনেকগ্রামে আধুনিক রুচিসম্মত গৃহসজ্জার অনেক উপকরণ হিসেবে পোড়ামাটি তথা টেরা কোটার কাজ করছেন অনেকে। জেলার শিল্পদপ্তর থেকে আর্থিক আনুকূল্যেও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন অনেকে।

মাটির গুণাগুণে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কারিগরি দক্ষতা ও ক্রেতার চাহিদা। তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্দরাণফুলবাড়ী গ্রামের প্রবীণ মৃৎশিল্পী 'খোকারাম পালের' মতে মৃৎ শিল্পে এঁটেল মাটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং উপযুক্ত। কোচবিহারে মৃৎশিল্পীগণ বেশীরভাগই আসামের গোয়াল পাড়া, গৌরীপুর, তুফানগঞ্জের চিলাখানা গ্রাম থেকে মাটি সংগ্রহ করেন। কোচবিহার জেলার মৃৎশিল্পীদের নক্‌সাযুক্ত ও সাধারণ উপকরণের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলার উপকরণের মিল দেখা যায়। জেলার বিভিন্ন গ্রাম্য-মেলা ও হাটে - বাজারে মৃৎশিল্পজাত যে সামগ্রী গুলি সবচেয়ে বেশী তৈরী হয়, সেগুলি হল বিভিন্ন আকারের মাটির ঘট, বিয়ের সরা, মালসা ও ঢাকনা, পিলসূজ, ধূপদানি, কলকি, পাতিল, বিচিত্র দুর্গা ও লক্ষ্মীরসরা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জেলার বিভিন্ন গ্রামে আমরা দেখতে পাই একটু সম্পন্ন মৃৎশিল্পীগণ মাটির হাঁড়ি, কলসী ও ফুলের টব তৈরীতে চাঁকের ব্যবহার করেন। অনেকে সরাসরি হাত দিয়েই তৈরী করেন। স্থানীয় মৃৎশিল্পীগণ এঁটেল মাটির পাশাপাশি একধরনের কালোমাটিও ব্যবহার করেন। বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সবাই উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন পলিমাটি, খয়ার ও খাওয়া সোডা। তারা এই উপকরণ জ্বাল করে কাঁচামাটির তৈরী বস্তু রঙ করে তারপর পোড়ান। কাঁচা উপকরণগুলি

শিল্পীগণ সাধারণ ভাবে পোড়ান কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসে। অনেকে হাঁড়ি কলসী রঙ করার জন্য টায়ার পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়ে কালো রঙ করেন। মৃৎশিল্পীগণ বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি তৈরীর সময় মাটির সঙ্গে পাট, খড় কেটে মিশিয়ে দেন। কোচবিহারের মৃৎশিল্পীদের উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন হল পোড়ামাটির অলঙ্কারযুক্ত পুতুল। যেমন — হাতি, ঘোড়া, বাচ্চাদের খেলনাবাটি, বুড়া বুড়ি প্রভৃতি সম্পূর্ণ হাতে তৈরী। শিল্পদ্রব্য গুলি বিপননের সুযোগ একমাত্র বিভিন্ন গ্রাম্য মেলা। সকল ক্ষেত্রে শিল্পীরা কাঁচামাটির পুতুল হাতে তৈরীর পর রোদে শুকিয়ে নেন। নির্মিত দ্রব্য সরাসরি হাতেই তৈরী হোক আর চাকেই তৈরী হোক সকল ক্ষেত্রে পালিস করবার জন্য 'ব্যাও' ব্যবহার করেন। এটি দেখতে অনেকটা ছুরির মত। কোচবিহার জেলায় এই ব্যাও এর পরিবর্তে পাতলা বাঁশের কায়েম বা বাতি ব্যবহার করেন। মৃৎশিল্পের হাঁড়ি, পাতিল পুতুল যাই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই এরা এক ধরনের লাল রঙ ব্যবহার করেন। লোক শিল্পের অন্যান্য আঙ্গিকের মত মৃৎশিল্পীগণও শুধুমাত্র এই কর্মের মাধ্যমে জীবন জীবিকার ভরসা না করে কৃষিকাজের সঙ্গেও যুক্ত থাকেন। বাংলাদেশের লোকধর্মের মত বাংলা পুতুল প্রতিমা শিল্পের প্রধান উৎস। ঘট, পট ও পুতুলের সীমা ছেড়ে এই মনুষ্য রূপ লাভ করার পিছনে বাংলার লোকসমাজে রূপ চেতনা ছিল সক্রিয় ও প্রখর। জেলার বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা একাধিক লোকশিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

জেলাসদরের কালজানি গ্রামের বাসিন্দা আরতি বালা পাল, স্বামী চন্দ্র কান্ত পাল, তিন পুরুষের মৃৎশিল্পী। যন্ত্র ব্যতীত সম্পূর্ণ হাতে তৈরী করেন পোড়ামাটির পুতুল, ঘট, কলসী ইত্যাদি। মেখলীগঞ্জ মহকুমার নালারটারী গ্রামের স্থানীয় প্রবীণ মৃৎশিল্পী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় চারপুরুষের বংশানুক্রমিক শিল্পী। তিনি মাটির কাজের পাশাপাশি শোলাশিল্পেও দক্ষ। মৃৎশিল্পী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মাটির মাসান, যখাযখি, বিভিন্ন পুতুলের পাশাপাশি শোলার ফুল, মুখোশও তৈরী করেন।

মেখলীগঞ্জ মহকুমার ১৩৯ বক্না বান্দা গ্রামের ফকিরচাঁদ পাল, পিতা নীলমোহন পাল, ঢাকা জেলার সিন্দলিয়ার দুর্গা ও ভাণ্ডানী মূর্তি তৈরী করেন। মাটির কাজের উপর রঙ ব্যবহারে দক্ষতা শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন গ্রাম্য মেলা বাদ দিলে ধাপরা, জামালদহ, মেখলীগঞ্জ, চ্যাংরাবান্দা প্রভৃতি অঞ্চল শিল্পীর কাজের বাজার। কোচবিহারের লোকশিল্পীরা দেবদেবী মূর্তি তৈরীতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানেন না। লোকধর্মের সঙ্গে বাংলার লোক শিল্পের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে বলেই শিল্পীর কল্পনা লোকানুগ এবং স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত।

জেলার প্রায় ১০০০ মানুষ এই মৃৎশিল্পকে জীবিকা হিসেবে ধরে রেখেছেন। বক্সির হাটের গাজীর কুঠী গ্রামের মৃৎশিল্পী টুলু বর্মন মাসানের মূর্তি তৈরীতে একজন দক্ষ শিল্পী। দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের রাজবংশী মৃৎশিল্পী কণ্ঠেশ্বর বর্মন তাঁর শিল্পগত দক্ষতার জন্য বাংলার বাইরেও প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হল দুর্ঘটনা, উদ্বাস্তু, দুর্ভিক্ষ মহামারী, খুন ও মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি তৈরী করা। তিনি প্রতি বছর এই ব্লকের ধূমদহ পার স্নান মেলা উপলক্ষ্যে ১৫ দিন ব্যাপী এক একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার পালপাড়া গ্রামের বংশানুক্রমিক মৃৎশিল্পী নারায়ণ চন্দ্র পাল ১লা জ্যৈষ্ঠ চাক পূজা দিয়ে কাজ শুরু করেন। কোচবিহারের মৃৎশিল্পীদের দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় এক সম্প্রদায় তাদের শিল্প কর্মের উপকরণ শুধু পোড়ামাটিই বেছে নেন। পূর্ববঙ্গীয় ফরিদপুর জেলার মৃৎশিল্পী বর্তমানে মারুগঞ্জ নিবাসী সুকুমার পাল এবং চিলাখান গ্রামের ধীরেন পাল, শ্রীদাম পাল বিচিত্র লক্ষ্মীর পট ও সরা তৈরীর দক্ষ শিল্পী।

১৯৯৬-৯৭ সালে জেলাস্তরে কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর আয়োজিত প্রদর্শনীতে জেলাসদরের কুমারটুলী অঞ্চলের মৃৎশিল্পী গোবিন্দ পাল পোড়ামাটির মুদ্রা তৈরী করে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

বাঁশ শিল্প ঃ

আর্ট বা শিল্পকর্মের Motive বা নক্সা ইত্যাদির ব্যাপারে জেলার পাঁচটি মহকুমা অঞ্চলের কোচবিহারের স্থানীয় মানুষ বাঁশের উপর নির্ভর করেই অপূর্ব শিল্প কর্মের নিদর্শন রেখেছেন। অনেকে আবার জেলা বা রাজ্যস্তরে শিল্প দপ্তরের সৌজন্যে আয়োজিত অনেক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন। যেমন জেলা সদরের পানিশালাগ্রামের জগমোহন বর্মন বাঁশের খাঁচা তৈরী করে, উক্তগ্রামের বৃন্দাবন বর্মন ঝুড়ি তৈরী করে, নিউকোচবিহারের বাইশগুড়ি গ্রামের প্রাণ নাথ দাস

বাঁশের নানা জিনিস তৈরী করে রাজ্য স্তরে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্দরাণফুলবাড়ী গ্রামের নৃপেন (ঢোলা) বর্মন বাঁশের গুড়ি দিয়ে অশোকস্তম্ভ তৈরী করে রাজ্যস্তরে প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হন। নান্দনিক সৌন্দর্য নির্ভর বাঁশের কারুকার্য খচিত শিল্পকর্মের দক্ষশিল্পী নৃপেন বর্মন (ঢোলা), কোচবিহার দেবীবাড়ীর তোর্ষাচরের যতীন মোদক ও দিনহাটার ভেটাগুড়ি অঞ্চলের বিশুবর্মা কোচবিহারের বাঁশের শিল্পদ্রব্যকে বাংলার শিল্প রসিক সমাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বাঁশ শিল্পের দক্ষশিল্পী নৃপেন বর্মনের মতে "মাকলা বাঁশ এবং খুঁটির উপযুক্ত বড় বাঁশ শিল্প কর্মের সবচেয়ে উপযুক্ত বাঁশ। এছাড়াও একাজে প্রয়োজন হয় আঠা, ফেবিকল, পিন, তারকাটা, বেত ও প্লাস্টিকের সূতা।" বাঁশের তৈরী বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যগুলি হল ঝুড়ি, বাঁশের টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, কলমদানি, ঘট, নানা রকম ফুল ও মডেল হিসেবে অশোকস্তম্ভ। এছাড়াও মাছ ধরার নানা উপকরণ যেমন — ধেউলি, বারুন, খলুই, জাকই, ঝোকা, থোরকো, জোলোঙ্গা ইত্যাদি।

বাঁশ শিল্পের প্রধান উপকরণ হল মাকলা বাঁশ। এই বাঁশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে ঘুন ধরে না। শুধু লোকশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র কোচবিহারের সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যেই লৌকিক পূজা পার্বণ থেকে শুরু করে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত পর্যন্ত এতদঞ্চলের বাঁশের বহু ব্যবহার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে। শিল্প কর্মের উপযুক্ত উপরিউক্ত বাঁশ ছাড়াও যে সকল বাঁশ এতদঞ্চলে জন্মায় সেগুলি হল নলবাঁশ, ঝাড়বাঁশ ইত্যাদি।

কোচবিহার লোকশিল্পের বড় নিদর্শন বাঁশের বাঁশি। সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে বাঁশের কাজে ত্রিপুরা সুনাম অর্জন করলেও উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের লোকশিল্পীগণও এ ব্যাপারে কম এগিয়ে নেই। জেলার অনেক শিল্পী বিশেষ করে তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ দারিদ্র্য উপেক্ষা করেও বংশানুক্রমিক ভাবে এই শিল্পকে রক্ষা করে চলেছেন।

তুফানগঞ্জ মহকুমার দেওচড়াই গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁশের দরমা তৈরীর প্রবণতা বেশী। কোচবিহার জেলায় মেয়েরাও একাজে দক্ষ। মুলি বাঁশ মূলত আসামে উৎপাদিত হলেও কোচবিহারের অনেক জায়গায় এ বাঁশ জন্মায়। এই বাঁশের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের নিদর্শন হল বাঁশি। যেমন — আড়বাঁশি, মুরুলী বাঁশি, ব্যারল বাঁশি ও বেনু বাঁশি, একমুখ ও দুইমুখ খোলা বাঁশি এখানে প্রস্তুত হয়।

জেলার লোক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এতদঞ্চলের গ্রামীণ কৃষি সমাজের মানুষ, যাদের কুশলী দক্ষ হাতের স্পর্শে বাঁশ, কাঠ, মাটি, শোলা বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে ওঠে নান্দনিক শিল্পকর্মের মাধ্যমে। কোচবিহারের বাঁশি শিল্পের খ্যাতি তাই আজও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

বাঁশের সঙ্গে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দিয়ে যে কারুকার্য মন্ডিত শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় দুটি সম্প্রদায়ের উৎসবে, তার একটি হল মুসলিমদের তাজিয়ায় অপরটি হিন্দুদের রাসমঞ্চে।

জেলা সদরের ঘুঘুমারী গ্রামের দক্ষ তাজিয়া শিল্পী আকবর মিঞা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে বাড়ির মন্ডপ ও পূজার আলপনার কাজ করে থাকেন। তাজিয়া তৈরীর মূল উপকরণ হল বাঁশ, কাগজ, পাট ও আঠা। কেটি তাজিয়ার উচ্চতা হয় সাধারণত ২৮ হাত লম্বা ও নীজে পাঁচ হাত চওড়া। সময় লাগে পঁচিশ দিন এবং সঙ্গে থাকে দুজন সহযোগী।

কোচবিহার মদনমোহন বাড়ীতে রাস উপলক্ষ্যে যে রাসমঞ্চ তৈরী হয় তার বর্তমান শিল্পী আলতাফ মিঞা। পূর্বে এই মঞ্চ তৈরী করতেন তাঁর পিতা আজিজ মিঞা এবং তারও পূর্বে আজিজ মিঞার পিতা। এখনও বংশানুক্রমিক ভাবে আলতাফ মিঞা এই কাজকরে চলছেন। ১৫০০-২০০০ টাকার মধ্যে উপকরণ সহ চুক্তি বদ্ধ ভাবে তিনি এই রাসমঞ্চ তৈরী করেন।

১৫, ২০, ২৮, ৩০ হাত পর্যন্ত লম্বা তাজিয়া এখানে তৈরী হয়। রঙ - বেরঙের কাগজ ও বিভিন্ন চিত্রপটে তৈরী কাটা কাগজের কারুকার্য খচিত তাজিয়ার মাঝখানে লম্বা পিতলের তলোয়ারের মত একটি বস্তু থাকে, যাকে স্থানীয় ভাষায়

বলা হয় পাঞ্জরা। তাজিয়া শিল্পীগণ হলেন বিহার মিঞা (শুকটা বাড়ী নিবাসী), আলতাফ মিঞা (ছাট গুড়িয়াহাটি, নিউটাউন) প্রমুখ তাজিয়া শিল্পের দক্ষ সহকারী ঘুঘুমারী গ্রামের গাটুমিঞা। জেলার হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এই শিল্পীগণের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেকথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

দারু ও কারু শিল্প ঃ

জেলার লোকশিল্পের অঙ্গনে দারু ও কারু শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু দৈনন্দিন জীবনের তাগিদেই নয় এর বাইরেও বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় উৎসবে এই সব জিনিসের চাহিদা রয়েছে। লোকশিল্পের নন্দন তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখা যায় কাঠের গুড়ি ও কাঠের টুকরো, বাঁশের গুড়ি ও বাঁশ, পাটজাতদ্রব্য, এছাড়াও কলাগাছ, পুরনো কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ডোরা কাটা মেখলি কিংবা কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে শিল্পী তার শৈল্পিক ও নান্দনিক চেতনার চোখে তুচ্ছ বস্তুকেও পরিণত করেন বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীতে। এই দারু শিল্পেরই একটি আঙ্গিক হল 'কাঠ খোদাই'।

জেলার কাঠ শিল্প কর্মটি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সূত্রধর সম্প্রদায়ের হাতেই প্রায় একচেটিয়া ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কালের বিবর্তনে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন স্বাভাবিক। সেই সুবাদে দারু তক্ষন শিল্পের মধ্যেও ঘটেছে বিশাল পরিবর্তন। একদিন চণ্ডীমন্ডপের খুঁটি, বাড়ির দরজা, জানালা, রথ এবং কাঠের বিগ্রহ তৈরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই শিল্পের বিস্তার। আবার কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই খোদাই শিল্পের দক্ষ কারিগর আছেন যারা তৈরী করেন অনেক লোকবাদ্য যন্ত্র। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দোত্‌রা ও সারিন্দা। এই দুটি লোকাবাদ্যযন্ত্র তৈরীতে যেমন কাঁঠাল কাঠ উপযুক্ত, তেমনি কাঠের মূর্তি, পুতুল, কারুকার্য মন্ডিত পশু পাখি ইত্যাদি তৈরীতে উপযুক্ত কাঠ হল সেগুন, গামারী। কাঠ খোদাই করা মুখোশের প্রচলন এতদঞ্চলে কম হলেও তুফানগঞ্জ মহকুমার হরিরহাট গ্রামের তিলেশ্বর বর্মন একজন দক্ষ কাঠের মুখোশ শিল্পী। নাটাবাড়ী কদমতলা গ্রামের মনশিক্ষা ও তুক্কার গায়ক নিজেই তৈরী করেন কাঁঠাল খুঁটার সারিন্দা ও দোতরা। আজও উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার ও তৎসংলগ্ন নিম্ন আসামের একটি প্রচলিত কথা হল - "কাঠের দোতরা কথা কয়"। জেলায় কাঠের কারুকার্য খচিত আসবাবপত্র তৈরীরও দক্ষ শিল্পী আছেন।

দক্ষিণ বঙ্গের বাঁকুড়া, কৃষ্ণপুর বর্ধমানের মতো দক্ষ দারু শিল্পী এতদঞ্চলে না থাকলেও তুফানগঞ্জ মহকুমার ক্ষুদিরাম মজুমদার, বক্সির হাট গ্রামের তিলেশ্বর বর্মন, কোচবিহার সদরের কালীঘাট রোডের সুবল সূত্রধর ও নিমাই সূত্রধর, দিনহাটা মহকুমার সিতাই গ্রামের রমেশচন্দ্র বর্মন জেলা ও রাজ্যস্তরের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নিগমের দ্বারা পুরস্কৃত দারু শিল্পী। ১৯৯৬-৯৭ সালের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প ধারার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যস্তরে ২০০১ কারু শিল্প প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে হাতি ও গণেশের মূর্তি তৈরীর জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন ক্ষুদিরাম মজুমদার। অপরপক্ষে সিতাই ব্লকের রমেশ চন্দ্র বর্মন ১৯৯৬-৯৭ সনে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় কাঠ খোদাই ক্ষুধার্ত্ত ঈগলের মূর্তি প্রদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ঐ একই বছরে হরিরহাটের তিলেশ্বর বর্মন কাঠের রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তৈরী করে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। দক্ষ দারু শিল্পী ক্ষুদিরাম মজুমদারের মতে "কাঠ খোদাই কৃত এই সূক্ষ্ম শিল্প কর্মের জন্য গামারী, সেগুন ও কাঁঠাল কাঠই উপযুক্ত"। কাঠ খোদাই শিল্পীদের তৈরী বস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাতি, হাতির পাল, গণেশের মূর্তি, ভেনাসের মূর্তি, হরিণ, বাঘ, ষাঁড়, সারস প্রভৃতি। এছাড়াও আছে বিভিন্ন মহাপুরুষের আবক্ষ মূর্তি।

দারু তক্ষন শিল্পের মূল যন্ত্রপাতি হল - করাত, ছোট বাটাল, হাতুড়ি, পেন্সিল, সিরিস কাগজ, অনেকক্ষেত্রে ফেবিকল আঠা। শিল্পী প্রথমে কাঠের টুকরোর উপর কল্পিত মূর্তি পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে নেন। তারপর সেই স্কেচ অনুযায়ী ছোট বড় বিভিন্ন বাটাল দিয়ে কুঁদে কুঁদে মূর্তির অবয়ব তৈরী করেন। এ খোদাই কাজে মূর্তির বাড়তি অংশ ধরে কাজ শুরু করতে হয়। মুখ ও চোখের কাজ সবার শেষে করেন। অনেক সময় খোদাই কৃত মূর্তির স্বাভাবিক রঙ ছাড়াও কৃত্রিম রঙও ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধারা জেলা ও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবছর প্রতিযোগিতা মূলক প্রদর্শনী করে যেমন উৎসাহ দেওয়া হয় তেমনি পুরস্কৃতও করা হয়। কারু কার্য মন্ডিত এই শিল্প দ্রব্যের বিপণন হয় ঐ একই সময়ে।

মেখলী শিল্প ঃ

জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কারু শিল্প তথা লোক শিল্প হল মেখলী শিল্প। মেখলীগঞ্জের স্থানীয় ভাষায় একে বলে "ঝালক"। বিগত ১৪-৪-৯৭ ইং তারিখে মেখলীগঞ্জ মহকুমার ক্ষেত্র সমীক্ষায় এক সাক্ষাৎকারে কাশিয়াবাড়ী গ্রামের প্রধান শিল্পী মেনকা রায় ও সন্ধ্যামনি রায়, জানান 'মেখলী তৈরীর কাজে পরিবারের মেয়েদেরই ভূমিকা বেশী'। মেখলী প্রকৃত পক্ষে লাল, সাদা, কালো হলুদ রঙের ডোরা কাটা এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য বিশিষ্ট চট বা মাদুর বিশেষ। মেখলীগঞ্জ মহকুমার নামকরণও হয়েছে মেখলী শিল্প থেকে। W.W. Hunter সাহেব তাঁর Statistical Account of Bengal গ্রন্থে জেলার বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন এই লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন — 'The Mekhli is a coars cloth made of jute and used for sereens bedding etc. It takes its name from the subdivisional town of Mekhliganj where it is largely manufactured.'[৫]

হান্টার সাহেব শুধুমাত্র মেখলী থেকে মেখলীগঞ্জ নামের উৎপত্তির কথাই বলেননি, তিনি লক্ষ্য করেছেন একদিন উক্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মেখলী উৎপাদিত হত।

মেখলী বা মেখলা তৈরীর মূল উপকরণ হল একধরনের সূতো যা তৈরী হয় পাট, কলাগাছ ও পুরনো কাপড় থেকে। একে রঙ করে তৈরী হয় মেখলী। এটি তৈরী হয় সাধারণত তাঁতের মত যন্ত্রের সাহায্যে। এছাড়াও মেখলা তৈরীতে প্রয়োজন হয় সুপারী গাছের অংশ বিশেষ, বাঁশ ও দড়ি। তা সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় মেখলী তৈরীর অপরিহার্য সূতা। যাকে বলা হয় "কুংকুরার সূতা" এটি দেখতে অনেকটা পাটের গাছের মত। একদিন এতদঞ্চলের মানুষের পোষাক ছিল রঙিন মেখলা। কোচবিহারের অনেক লোক সঙ্গীতে কুংকুরার সূতার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন — "আহারে কুংকুরা হলু লোহার গুণারে .....।"

উপরিউক্ত সকল উপকরণই মহকুমার ভোটপট্টি গ্রামের তাঁতি পাড়া থেকে মেখলী শিল্পীরা কিনে থাকেন। বর্তমানে এই সূতা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং কিছুটা উদ্যোগের অভাব জনিত কারণে কোচবিহারের প্রাচীন এই লোকশিল্প আজ বিলুপ্ত প্রায়। উক্ত মহকুমার পৌর এলাকার প্রবীণ শিক্ষক মুরারী মোহন সিংহ এক সাক্ষাৎকারে জানান 'তাঁর বাড়িতে বংশানুক্রমিকভাবে মেখলী তৈরী হত সাদা, কালো, হলুদ, ডোরাকাটা রঙের সূতা দিয়ে'। মেখলীগঞ্জের মানুষ একদিন নক্সীকাঁথার অনুকরণে একে মেখলী কাঁথাও বলতেন। জেলার একমাত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমার চার, পাঁচটি গ্রামের কিছু সংখ্যক পরিবার লোকশিল্পের এই আঙ্গিকটির সঙ্গে জড়িতথাকলেও মূলত তাঁরা কৃষি নির্ভর।

শাঁখা শিল্প ঃ

বাংলার লোকশিল্পের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের প্রান্তবর্তী এই জেলার অবস্থান একেবারে নগন্য নয়। লোকশিল্পের অন্যান্য উপকরণের মত শাঁখা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকশিল্পীর সংখ্যা এতদঞ্চলে অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় কিছুটা কম।

ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একমাত্র তুফানগঞ্জ মহকুমাই শাঁখাশিল্পের কেন্দ্রভূমি। জেলায় প্রচলিত শাঁখাশিল্পের যে ডিজাইন বা নক্সাগুলো বেশী প্রচলিত সেগুলি হল শঙ্খলতা, কঙ্কণ, লেচুকাটা, ধানছড়া, তারপ্যাচ ও ফুলপাতা।

এতদঞ্চলের শাঁখাশিল্পীগণ শঙ্খ জাতীয় কাঁচামাল থেকে শাঁখার উপর কারুকার্য মন্ডিত কাজ করলেও এর বিপণনের সঙ্গেই তারা যুক্ত বেশী। প্রসঙ্গত বলা যায় এই জেলায় দক্ষ শাঁখাশিল্পীর চেয়ে শাঁখা বিক্রেতাই বেশী। যারা মূলত মুর্শিদাবাদ, জিৎপুর, কলকাতার মহাজনদের উপরনির্ভরশীল। হিন্দু সধবা নারীগণের হাতে শাঁখা পরানোর সময় শাঁখা শিল্পী ও বিক্রেতাগণের মধ্যে ধানদূর্বা দিয়ে সধবা নারীকে আশীর্বাদ করার প্রচলন আছে এবং সে সময় সধবা নারীর মঙ্গল কামনায় তারা বলেন "জন্মে অস্তি সুখে থাক, তোমার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক"।

শাঁখা তৈরীর যন্ত্রপাতি গুলি হল চ্যাপটা রেত করাত বা কুশ করাত, গোলরেত, চার ফাইলা রেত, একদরা নামক

একধরনের দা, ভোমর নামক ফুটা করার যন্ত্র, দেরাল, বাটাল, হাতুড়ি ইত্যাদি। শঙ্খ কেঁটে শাঁখা বের করার পর সান বাঁধানো এক ধরনের পাটায় ধূপ ও বালুদিয়ে ঘষে উপরের অংশের ছাল তুলে মসৃন করা হয়। এরপর শুরু হয় কারুকার্য। শিল্পীগণ শঙ্খ কেঁটে শাঁখার উপর যন্ত্রপাতি দিয়ে কারুকার্য করার পর একটি বড় ও একটি ছোট একই ডিজাইনের দুটি শাঁখাকে নীল সূতা দিয়ে বেঁধে জোরা তৈরী করেন। নিয়ম মাফিক বড়টা ডান হাতে ও ছোটটা বাঁ হাতে পরানো হয়। কারুশিল্পীগণ শঙ্খ ও কাটা শঙ্খ সংগ্রহ করেন কোলকাতা, ব্যারাকপুর, মুর্শিদাবাদ, বেলেডাঙা ও জিৎপুর থেকে। স্থানীয় শাঁখা শিল্পীগণের মতে ১লা বৈশাখে মেঘালয়ের তুরার চরণ তলা গ্রামের কালীপূজার মেলা, আসামের বিজনীর লক্ষ্মীপূজার মেলা, তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সীর হাটের পলীকার মেলা, দিনহাটা মহকুমার মাধাইখালের কালী মেলায় সর্বাধিক শাঁখা বিক্রী হয়। স্থানীয় লোকবিশ্বাস শনি ও মঙ্গল বার বাদে শাঁখা পরার প্রশস্ত সময় হলো বুধবার ও বৃহস্পতিবার। এতদঞ্চলে নক্সা অনুযায়ী প্রচলিত শাঁখা গুলি হল - মান্ডাসা, ব্রেসলেট, চুড়ি শাঁখা ইত্যাদি।

শোলা শিল্প ঃ

কোচবিহারের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অন্যতম লোকশিল্প শোলাশিল্প। এই শিল্পটিকে মূলত আজও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মালাকার ও চিত্রকর উপাধিকারীগণ বংশানুক্রমিক ভাবে ধরে রেখেছেন। লোকায়ত পূজা পার্বন ও বিবাহের মত পবিত্র অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে শোলার ফুল, শোলার মুখোশ, চাঁদমালা, মুকুট মালা, কদমফুল, মাসান ও যথাযথি লোক দেবতার প্রতিকৃতি রাজবংশী শোলা শিল্পীগণ তৈরী করেন। জেলার সবকটি গ্রামাঞ্চলে শিল্পীগণ এই শিল্প চর্চায় মগ্ন থাকলেও শহুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটে হিন্দু বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষ্যে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই জেলা সদরের ভেটাগুড়ি, বানেশ্বর, তুফানগঞ্জ মহকুমার হরির হাট গ্রামের ঠালাডুমি সংলগ্ন অঞ্চলে এই শিল্পীগণের বসবাস বেশী। জেলার প্রায় সাত আট শত লোকশিল্পী এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

কোচবিহারের শোলাশিল্প দীর্ঘদিন কোচবিহারের রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। কোচবিহারের রাজাদের বিভিন্ন ধর্মীয় পার্বণ ও উৎসবে স্থানীয় মালাকার সম্প্রদায়ের শোলা শিল্পীগণ শোলার কাজের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতেন। কালের বিবর্তনে আজ আর রাজা নেই, লোকরুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে। তা সত্বেও তৎকালীন শিল্পীদের বর্তমান প্রজন্ম পূর্ব স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে প্রতিদিন নিত্য নূতন শিল্প কৌশল সৃষ্টি করে চলেছেন। জেলার চিত্রকর ও মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ অনেকেই শোলা শিল্পের কাজ ছেড়ে জীবন জীবিকার তাগিদে ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। স্থানীয় রাজবংশী হিন্দু শোলা শিল্পীগণ ছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশকিছু মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাদের অন্যতম গাটুমিঞা আজও বংশানুক্রমিক ভাবে মহরমের তাজিয়া ও হিন্দুর রাসমঞ্চ তৈরী করেন। প্রকৃতপক্ষে শোলা শিল্পের প্রচলন ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে অনেক শোলা শিল্পী জানান অনেকেই পাঁচ ছয় পুরুষ ধরে এই কাজে নিযুক্ত। তবে এই শিল্পের জন্য যেমন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি। বাঁশ, কাঠ, পাটি ও তাঁত শিল্পীগণ যতটা সরকারি আনুকূল্য পায় এরা ততটাই বঞ্চিত। তাই পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রচলিত লোকশিল্পের এই আঙ্গিকটির সংরক্ষণ, বিস্তার ও বিপণনের দিকে সরকারী দৃষ্টি পড়লে আরও বেশী সংখ্যকমানুষ এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারবেন। জেলার অনেক লোকশিল্পের মত এটি তেমন সংগঠিত নয়। কাঁচামালের যোগান বিশেষ করে সংরক্ষিত জলাশয়ে শোলাচাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হলে জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির এই নিদর্শনটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত, রাজ্য ও জেলাস্তরের পুরস্কারে সম্মানিত দারু ও কারু শিল্পের একাধিক শিল্পী থাকলেও শোলা শিল্পীগণ আজও লোক চক্ষুর অন্তরালেই আছেন।

শোলা শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল শোলা গাছ। সাধারণত গ্রামের বিল ও জলাশয়ে এই শোলাগাছের জন্ম হয়ে থাকে। তুফানগঞ্জ মহকুমার টাকুয়ামারী, রসিক বিল অঞ্চলের জলাশয় উৎকৃষ্ট শোলা বা জলজ উদ্ভিদের বড় উৎসভূমি। সাধারণত ভাদ্র মাসে জল থেকে শোলা তুলে শুকানো হয়। জল থেকে শোলা তুলে শুকিয়ে শিল্প কর্মের উপযোগী করা থেকে মূর্তি তৈরী করার পর্যায়ক্রম পর্যন্ত শোলার জন্ম কথা নিয়ে দিনহাটা মহকুমার শিমূলবাড়ী ও কিসমতদশ গ্রামের রাজবংশী শোলার শিল্পীগণের মধ্যে এক ধরনের গান প্রচলিত আছে। যেমন —

"এক হাঁটু জলতে তোক শোলাক কাটুনু

তোক শোলাক মুই রৌদোতে শুকানুরে — এ
তোক শোলাক মুই রৌদোতে শুকানুরে —
ভাসুরের গালি শুনিয়ো তোক সাইট মা
গরানু বৈসে সাট মাও জোড়া মন্দির
ঘরে রে বৈসে সাট মাও জোড়া
মন্দির ঘরে রে — রে।।"

(সংগ্রহ — রাণী রায়, গ্রাম ঃ কিসমৎদশগ্রাম, দিনহাটা, ১০/৫/৯৮ ইং)

স্থানীয় রাজবংশী দক্ষ শোলার শিল্পীগণ শোলাকে কেটে বিভিন্ন আকার দিয়ে ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যের রূপ দিয়ে বিভিন্ন বস্তু তৈরী করেন। ষাইটল দেবী ও কানিবিষহরির মূর্তি তৈরীর জন্য ত্রিকোণাকৃতি ভাবে পাতলা শোলার ড্রাম তৈরী করে তাতে লোক শিল্পীগণ লাল, হলুদ, কালো রঙ দিয়ে বিভিন্ন মূর্তির প্রতীক তৈরী করেন। শোলা শিল্পের যে বিভিন্ন উপকরণ গুলি প্রয়োজন সেগুলি হল - আস্ত শোলা, আঠা, সাদা, কালো ও রঙিন বিভিন্ন কাগজ, বাঁশ, লাল, নীল, কালো রঙের সূতা, রাংতা, ধারালো কাটারি বা চাকু, কাঁচি তুলি প্রভৃতি। শোলা শিল্পে ব্যবহৃত রঙ তৈরীতে অনেকে ব্যবহার করেন চালের জল, শুকনো পাটের পাতা, হাঁসের ডিম, হাঁড়ির কালি ইত্যাদি। এগুলির মিশ্রণেই তৈরী হয় বিভিন্ন রঙ। অনেক গ্রামে শোলা কাটার দাকে কাতি বলে। শোলা শিল্পীগণ শোলার মাসান মূর্তি তৈরীর সময় বিশেষ করে চক্ষু দানের সময় এক ধরনের লোকমন্ত্র উচ্চারণ করেন।

সময়ের বিবর্তনে লোক শিল্পের অনেক অঙ্গনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও কোচবিহারের শোলা শিল্পীগণ আজও বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র ও প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। লোক শিল্পের ক্ষেত্রে লোক দেবতার মূর্তি তৈরীতে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় চরকা টাকুয়া নামক শিশু রোগ প্রতিরোধকারী দেবতার প্রতিমূর্তি তৈরীতে। শোলা শিল্পের একটি বড় আঙ্গিক হল কালীর মুখোশ তৈরী। জেলার স্থানীয় লোক শিল্পীগণ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন রীতি ও বৈশিষ্ট্য মেনে যে বিভিন্ন উপকরণ গুলি তৈরী করেন সেগুলি হল শোলার মুখোশ, কালী, বুড়া বুড়ি ও হনুমান, শোলার ফুল, মঞ্জুষা প্রভৃতি। লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কানি বিষহরি, পদ্মা, পাঁচচুঙ্গা ও দুই চুঙ্গা, ষাইটল, যখাযখি প্রভৃতি। ঝাড়ু, কদম ফুল, বিয়ের মুকুট, অন্নপ্রাশনের মুকুট প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে যে সকল শোলা শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তারা হলেন — দিনহাটা মহকুমার সুধীর চন্দ্র মালাকার, ও শচীন চন্দ্র মালাকার, ভেটাগুড়ির প্রভাতি মালাকার (জেলান্তরের পুরস্কার প্রাপ্ত) নালার টারি গ্রামের প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, যোগেশ চন্দ্র রায় ও ডোকামালী, জেলা সদরের নলিনী কান্ত রায় (খারিজা সোনারী), ননী গোপাল, ঝাপসী বাড়ী গ্রামের কানাই মালাকার ও মনীন্দ্র মালাকার। এছাড়া তুফানগঞ্জ মহকুমার রসিকবিলের শ্যাম চরণ বড়ুয়া, ভান্ডি জেলাসের নলিন মালাকার (বর্মন), হরিরহাটের ইন্দ্রমোহন বর্মন, বাঁশ রাজা গ্রামের ভবেন বর্মন, মানিক বর্মন, ঘোগার কুঠী গ্রামের অখিল সরকার প্রমুখ। রাস মেলায় রাস মঞ্চ তৈরীতে, পুতুল তৈরীতে, মঞ্চসজ্জায়, ঝালর প্রভৃতিতে শোলার ব্যবহার দেখা যায়।

জেলার শোলা শিল্পীগণ মূলত কৃষি শ্রমিক। কৃষি কাজের অবসরে বছরের বিভিন্ন পূজাপার্বনে কিংবা বিভিন্ন লোক উৎসবের সময়ই লোক শিল্পের এই উপকরণ বিক্রির প্রধান সময়। তাই মৃৎশিল্প, দারুশিল্প ও বাঁশ শিল্পের মত দৈনন্দিন প্রয়োজন ভিত্তিক উপকরণের চাহিদা ভিত্তি করে জীবিকা অর্জনের এক নির্ভরযোগ্য উপায় হিসেবে শোলার শিল্পীগণ তাদের শিল্প কর্মকে বেছে নিতে পারেন নি। যদিও বংশানুক্রমিক ভাবে যেমন এই শিল্পের সঙ্গে সবাই যুক্ত নয় তেমনি শোলা শিল্পের ক্রম হ্রাসমান গতিকে রোধ করা যাবে না। এছাড়া দেখা যায় শোলা উৎপাদক অঞ্চলগুলি কৃষি কর্মের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কারণ বানিজ্যিক ভিত্তিতে শোলার তৈরী বস্তু অপেক্ষা কৃষি কর্মে আয় বেশী।

কোচবিহারে শোলার শিল্পের ঘরানা কোচবিহারের রাজ আমল থেকেই জানা যায়। সেই সময় থেকেই বংশানুক্রমিক

ভাবে আজও অনেকে এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি অনেক দক্ষ শোলার শিল্পী রাজ আমলে ভরণ পোষণ পেতেন। বর্তমানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ এই কাজে যুক্ত। সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় আজ পর্যন্ত শোলার শিল্পীদের উপর কোন Survey করা না হলেও ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা জানতে পারি জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ছ/সাত শত মানুষের জীবিকা এই লোক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

দক্ষিণবঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের মত এই শিল্পের ব্যাপকচর্চা না থাকলেও কোচবিহার জেলায় শোলার কাজ একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প কীর্তি। জেলার পাঁচটি মহকুমার সর্বত্রই এই শিল্পের প্রচলন থাকলেও তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মহকুমার দুটি ব্লক, মাথাভাঙ্গা মহকুমার ২ নং ব্লকে এই শিল্প মূলত কেন্দ্রিভূত। বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সবাই কাজে পারদর্শী। তবে শিল্পকর্মের প্রচলন বা চর্চা যাই থাকুক না কেন এর বিপণন ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত। শুধুমাত্র পূজা পার্বণ ও লোক উৎসব মেলার সময়ই এই শিল্পীদের চাহিদা বাড়ে। জেলাসদর ও মহকুমার দশকর্মা ভান্ডার নামক দোকান গুলিই এই শিল্প দ্রব্যের বড় গ্রাহক। জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই শিল্পের প্রভাব অপরিসীম। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। পাশাপাশি দরকার আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সর্বোপরি কৃত্রিম শোলা বা থার্মোকলের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শোলা শিল্প আজ সঙ্কটের সম্মুখীন।

মুখোশ শিল্প ঃ

লোকায়ত শিল্পের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিল্প মুখোশ শিল্প। লৌকিক সমাজ জীবন নির্ভর কোচবিহার জেলার বিভিন্ন লোক উৎসব যেমন - মাঘ মাসে বুড়া বুড়ির মাগন তোলার সময় কিংবা কালীর মুখোশ পরে মাগন তোলার প্রচলন আছে। কাঠের মুখোশের তুলনায় শোলার মুখোশের ব্যবহার এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী।

কোচবিহার জেলায় দিনহাটা, হলদিবাড়ি, তুফানগঞ্জ ও জেলা সদরের বানেশ্বর ও ডোডেয়ার হাট গ্রামে শোলার মুখোশ শিল্পীগণের সাধারণভাবে রঙ করা সাজানো মুখোশের কারিগরি দক্ষতার সহজ প্রকাশের পাশাপাশি মিলে মিশে থাকে শিল্পদৃষ্টি ও কর্মকুশলতা। অর্থের প্রয়োজনে অনেক মুখোশ শিল্পী নিজেই গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কোচবিহারের শোলার মুখোশ শিল্পীরা এখন জীবন ধারনের টানাপোড়েনে রুজি রোজগারের জন্য অন্যান্য কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছেন। তাদের কাছে অতীত গৌরব এবং রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা আজ স্বপ্ন মাত্র।

কোচবিহার সদরের ডোডেয়ার হাট গ্রামের চিত্রকর সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ বংশানুক্রমিক ভাবে বড় দেবীর কাঠাম পূজার দিন দেবীর ময়না কাঠের কাঠাম বা শিরদাঁড়ার মাথার কাপড়ের উপর রঙকরে তুলির টানে বড়দেবীর মুখোশ তৈরী করেন।

শোলার বিষহরি বা কানি বিষহরি ঠাকুরানীর শোলার বাইরের অংশ নাগ বিভূষিতা মনসা দেবীর চিত্র রঞ্জিতা হয়। দেবীর ডান ও বাঁ দিকে থাকে মৎস শিকার রত গোদা-গোদানী। এছাড়াও শিব, যোগিনী ও ধর্ম। অবশ্য প্রতিটি বিষহরির ডোলার রঞ্জিত চিত্র সমূহ একই রকম হয়না। লাল , কালো, হলুদ, সবুজ রং এসকল লৌকিক দেবদেবীর শোলার মূর্তিতে ব্যবহৃত হয়।

ধূপকাঠি শিল্প ঃ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কোচবিহারের লোক শিল্পের এক বিরল নিদর্শন স্থানীয় উপকরণে তৈরী ধূপ কাঠি। বাড়ির ছেলে মেয়ে উভয়ই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় ধূপ কাঠির উপকরণ পচা কাঠ, গোবর ও ধূনা দিয়ে মন্ড তৈরী করে ৮/১০ ই ঞ্চি লম্বা বাঁশের বা পাঠ কাঠির গায়ে মেখে শুকিয়ে গ্রামীণ হাটে বিক্রি করেন। লোকায়ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশেষ করে মাসান লোক দেবতার পূজায় এই ধূপ কাঠি একদিন অপরিহার্য ছিল। আধুনিক সুগন্ধি ধূপকাঠির দৌলতে এই ধূপকাঠি বিলুপ্তির পথে।

কোচবিহারের লোক শিল্পের বড় বৈশিষ্ট্য হল এই শিল্পীগণের বেশীর ভাগই লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। যেমন বিষহরি পালার মুখাবাঁশি যিনি তৈরী করেন তিনিই অনেক ক্ষেত্রে বাঁশি বাজান। যে ভবঘুরে শিল্পী বৈরাগী মনশিক্ষা ও তুক্ষার গান গেয়ে বেড়ান তিনি নিজেই আবার কাঁঠাল কাঠে তৈরী করেন সারিন্দা। এরূপ বস্তু ভিত্তিক লোক শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই শিল্পের অবলুপ্তির প্রধান কারণ একমাত্র বংশানুক্রমিক ভাবে কেউ একে ধরে রাখতে এগিয়ে না আসা। যেমন মেখলিগঞ্জের মেখলা শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। মেখলিগঞ্জ মহকুমার মেখলা শিল্পী মেনকা রায়ের মতে কাঁচা মালের যোগান, আর্থিক অস্বচ্ছলতা এজন্য দায়ী। গ্রামের মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ, সহজ সরল দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যেই বস্তুগত লোকশিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। কৃষি সরঞ্জাম, লোক বাদ্যযন্ত্র, লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি বিভিন্ন নক্সার উজ্জ্বল নিদর্শন গুলির বিশাল সমাবেশ ঘটে বিক্রয়যোগ্য উপকরণ হিসেবে জেলার বিভিন্ন মেলা ও লোক উৎসবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রযুক্তির যুগে বিজ্ঞাপন সর্বস্ব ভোগ বাদি সমাজে লোক শিল্পের প্রাণ ও প্রাচুর্য বাড়ে বাড়ে হোচট্ খাচ্ছে।

লোক শিল্পের যথার্থ বিপণন ব্যবস্থা ও বাজারের অভাবে তাই এই শিল্প প্রতিযোগিতার বাজারে কিছুটা দুর্বল, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যম বিমুখ এই শিল্প কর্মের সঙ্গে জনগণের মুখোমুখি পরিচয়ের সুযোগ একমাত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জেলা ও রাজ্য স্তরের বাৎসরিক প্রদর্শনী। কোচবিহারের লোক শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন যা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তিথি ও পূজা পার্বণ নির্ভর তা হল — স্থানীয় রাজবংশী সমাজের লোকশিল্পীগণের শোলার শিল্পকর্ম। যথাযথি, যাইট্ল, ঘোড়া বাহন মাসান, বিষহরি মঞ্জুষা, শোলার ফুল ইত্যাদি মূল উপকরণ গুলি গ্রামীণ সমাজে যেমন সৃষ্ট তেমনি সম্পূর্ণ যন্ত্র বর্জিত ভাবে লোক শিল্পীগণ হাতেই তৈরী করেন তাদের তুলিকার যাদুস্পর্শে। আবার কোচহিারের সংখালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের তাজিয়া শিল্পীগণের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। লোকশিল্পী আলতাফ মিঞা একই সঙ্গে মহরমের তাজিয়া ও কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ীর রাসমঞ্চ তৈরী করেন। দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের মত দক্ষ ও খ্যতিমান শাঁখা শিল্পী কোচবিহারে তেমন দেখা যায় না। যে কজন শাঁখা শিল্পী এতদঞ্চলে এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত তার অনেকটাই মুর্শিদাবাদ ও খাগরার কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, আর্থ সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত জীবন জীবিকার সংগ্রামে বিধ্বস্ত হয়েও বাঁশ, কাঠ, বেত, শোলা, শাঁখা, পাটী প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের এক বৈচিত্র্যময় শিল্প জগৎ সৃষ্টি করে চলেছেন কোচবিহারের লোকশিল্পীগণ।

যদিও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প নিগম অন্যান্য জেলার মত কোচহিারেও লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ সমন্বিত করে জেলার ঐতিহ্যপূর্ণ বিভিন্ন মেলা ও উৎসবের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তেমনি সরকারী তরফ থেকে দঃস্থ লোকশিল্পীদের আর্থিক অনুদান দিয়েও সাহায্যের চেষ্টা করেন, যাতে দুঃস্থ লোকশিল্পীগণ জীবিকার সুবিধার্থে এবং জেলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার মানসে উৎসাহবোধ করতে পারেন।

জেলার পাঁচটি মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা লোকশিল্পের যে অনুসন্ধান পাই তাতে দেখা যায় লোকায়ত শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষই কৃষি জীবী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং কৃষি নির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ক্ষেত্রানুসন্ধানে সাক্ষাৎকারে লোক শিল্পীগণ আক্ষেপ করে বলেন, আর্থ সামাজিক অব্যবস্থা কাঁচামালের অভাব, ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পকর্মে বংশানুক্রমিক ভাবে এগিয়ে না আসার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পালনের অখন্ড বিশ্বাস নিয়ে জেলার পাটী, মৃৎ, কাঠ, শোলা, শাঁখা, শিল্পীগণ কোচবিহারের লোকশিল্পকে ধরে রেখেছেন।

বিগত ১০-১৫ বছর ব্যাপী এই জেলায় অল্প হলেও কিছুটা শিল্পের উন্নতি হয়েছে। আর্থিক সঙ্কট ও প্রতিযোগিতার বাজারে বিশেষ করে মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ তাঁত, বাঁশ, পাট, পটারী, পাটী, শোলা, শাঁখা ও মৃৎ শিল্প মিলে জেলায় প্রায় এক লক্ষের অধিক মানুষ এর উপর নির্ভর করে জীবন জীবিকার সুরাহা করেন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও সমৃদ্ধি আশানুরূপ না হলেও কুটীর ও হস্তশিল্প আজ এতদঞ্চলে অনেকটা সমৃদ্ধ। কোচবিহারের শীতল পাটীর খ্যাতি ও বাজার আজ বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের অনেক রাজ্যের নজর কেড়ে নিয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হল যেমন উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, তেমনি উত্তরবঙ্গের অপরিহার্য সংস্কৃতি হল কোচবিহারের সংস্কৃতি যা নিজস্ব মহিমায় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কোচবিহারের কারুশিল্প তথা বাঁশ শিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান অস্বীকার করা যায় না। লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, পূজা ও পালা পার্বণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন হয় বাঁশের তৈরী বিভিন্ন বস্তু। কোচবিহারের রাজবংশী শিল্পীগণ তাদের নান্দনিক চেতনার বনের বাঁশকে রূপান্তরিত করেন বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীতে।

প্রাচীন কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নানা লোকশিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাত্যহিক জীবন জীবিকার স্বার্থে যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হত সে সব নিজেরাই বাঁশ, বেত, পাটী দিয়ে তৈরী করতেন। ফলে সেগুলোর মধ্যে শৈল্পিক মানসিকতার ছাপ ফুটে উঠত। যেমন — বাঁশের তৈরী মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈরী সামগ্রী, কাঠের বিভিন্ন লোকবাদ্য যন্ত্র ইত্যাদি কোচবিহারের লোকশিল্পের সুদৃশ্য নিদর্শন আজও দৃষ্ট হয়।

বলা বাহুল্য, জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হল এই লোকশিল্পগুলি। জেলার বিভিন্ন গ্রামে বংশানুক্রমিক ভাবে এর চর্চা আজও চলেছে। লোকশিল্পীর ব্যক্তি প্রতিভা, সমষ্টিগত চেতনা, সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এই শিল্প কর্মের মধ্যে। জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতেও লোক শিল্পের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই প্রধান। বার মাসের তেরো পার্বণের হাত ধরে ফি বছর যে উৎসব আসে তাকে নির্ভর করে বেঁচে আছে কোচবিহারের লোকশিল্প ও শিল্পীগণ।

তথ্য সূত্রঃ

১। লোকশিল্প — ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ - ৩৯৮ (১৯৯৫)

২। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — নারায়ণ চন্দ্র দে (৭৮), প্রশিক্ষক বেনী মাধব পাটী ফ্যাক্টরী এ্যাণ্ড পাটী মেকিং ট্রেনিং সেন্টার, ঘুঘুমারী, কোচবিহার, তাং - ৫/১১/২০০০ইং

৩। কোচবিহার গ্রামভিত্তিক পাটীশিল্পীদের পারিবারিক সমীক্ষা — ১৯৯৫ (১৫/২০/৯৫ - ১/১২/৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত) সৌজন্যে টগর রাণী দে।

৪। পাটী শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ) নারায়ণ চন্দ্র দে, প্রশিক্ষক - বেনীমাধব পাটী ফ্যাক্টরী অ্যাণ্ড পাটী মেকিং ট্রেনিং সেন্টার ঘুঘুমারী, কোচবিহার, পৃ - উল্লেখ নেই।

৫। Statistical Account of Bengal- W.W. Hunter, P- 397 Reprint (1974)